শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্পর্ক

নূর মহল খাতুন

গ্রামের মধ্যবিত্ত শিক্ষক পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে উঠা। শিক্ষক পরিবার বলছি তার কারণ আমার দাদা দেশ বিভাগের আগেই শিক্ষক ছিলেন। সে আমলে শিক্ষকদের পণ্ডিত মশাই বলা হতো, আমার দাদাও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খায়রুল পণ্ডিত হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৭১ সালে আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি তখন আমার দাদা অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছাড়াও আমার পিতা, মেজ চাচা, চাচাতো বোন, ফুফু, দুজন ফুফা, আমার ছোট বোন এবং আমি নিজে এই শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত। বর্তমানে আমার ছোট দুই বোন ছাড়া বাকি সবাই অবসরে গেছেন। আমাদের পরিবারকে এলাকার লোক কী যে সম্মান করত, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর অন্যতম প্রধার কারণ ছিল আমাদের পরিবারের শিক্ষকতা পেশা। আমরা নিজেরা যখন শিক্ষার্থী ছিলাম তখন আমাদের কাছে শিক্ষক ছিলেন অপার শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের যেমন শ্রদ্ধা করতাম, তেমন ভয়ও পেতাম।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়। ১৯৭৯ সালে আমি যখন ১০ম শ্রেণিতে পড়ি, তখন দাদার সাথে রাজশাহী থেকে ঢাকা গিয়েছিলাম। তখন যমুনা ব্রিজ তৈরি হয়নি, বাসযোগে নগরবাড়ি পৌঁছে ফেরিতে প্রায় ৩ ঘণ্টার নদীপথ পাড়ি দিয়ে আরিচা হয়ে ঢাকা যেতে হতো। তাও লক্কর-ঝক্কড় মার্কা বিআরটিসির বাসই ছিল একমাত্র ভরসা। দাদার সাথে আমি যখন ফেরিতে হাঁটাহাঁটি করছি ঠিক সেই সময় উর্দি-পরা সেনাবাহিনীর একজন অফিসার গাড়ি থেকে নেমে এসে মাথার ক্যাপ খুলে দাদার পায়ে কদমবুছি করলেন। ফেরির সবাই তো অবাক হয়ে আমাদের দেখছেন। দাদা বললেন, তুমি কে বাবা? তার নামটা আমার মনে নাই। উনি বলল, স্যার আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না! আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। আমি বাড়ির অংক না করার জন্যর আপনি আমাকে একদিন পেন্সিল-কল (এক ধরনের শারীরিক শাস্তি) করেছিলেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেছিলাম। পরে আপনি আমার বাসায় যেয়ে আদর করে এসেছিলেন, আর আব্বাকে আমার প্রতি খেয়াল রাখতে বলেছিলেন। এরপর থেকে আমি আর কোনদিন ক্লাশে সেকেন্ড হইনি। আপনার আশির্বাদে আমি এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর। আমি সেদিন দাদার চোখে যে আনন্দের ঝিলিক দেখেছিলাম তা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। একজন শিক্ষকের মনে হয় এটাই সব চেয়ে বড় পাওয়া।

আজ আমি নিজে একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে যখন দেখি আমার কোনো ছাত্র-ছাত্রী সফল হয়েছে, তখন আমি এক অনাবিল আনন্দে অবগাহন করি। কোনো একজন শিক্ষার্থী যখন এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে ম্যাডাম কেমন আছেন - তখন যে কী আনন্দ পাই তা বলে বোঝাতে পারব না। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক শুধু শাস্তি ও ভীতির নয় বন্ধুত্বেরও বটে। একজন শিক্ষার্থী তার মায়ের কাছে যে কথা বলতে পারে না সেটা তার প্রিয় শিক্ষকের কাছে অকপটে বলতে পারে।

আমার কাজের পরিসর ছিল অত্যন্ত সীমিত। সংসার ও চাকরির বাইরে আমার অন্য কোনো জগৎ ছিল না। তাই শিক্ষকতা ছিল আমার কাছে ইবাদতের মতো। তাতে জানিনা কতটুকু সফল হতে পেরেছি, তবে অতৃপ্তি রয়ে গেছে অনেক বেশি। এই অতৃপ্তির জায়গাটা একটু ব্যাখ্যা করতে চাই। আমার শিক্ষকতা শুরু ১৯৯৪ সালে যা বর্তমানে আলোচিত 'জেনারেশন-জি'র জন্মের ৩ বছর পূর্বে। অর্থাৎ এদেরকেই আমি পেয়েছি আমার ছাত্র হিসেবে। এই জেনারেশন যখন বেড়ে উঠছে তখন আমাদের দেশে প্রযুক্তিও আস্তে আস্তে বিকশিত হচ্ছে। শিক্ষাক্রমে নতুন ধারা যুক্ত হচ্ছে - প্রথমে নৈর্ব্যক্তিক, এরপর সৃজনশীল, তারপর বহুনির্বাচনী শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি। ফলাফল তৈরিতে যুক্ত হলো 'গড় গ্রেড পয়েন্ট' বা 'জিপিএ' পদ্ধতি। নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে শুরু হলো শিক্ষা বাণিজ্য। গাইড, কোচিং এর রমরমা ব্যবসা, একই সাথে প্রশ্ন ফাঁসও বিস্তার লাভ করলো। আগেও প্রাইভেট পড়ানো হতো, আমরাও পড়েছি তবে শুধুমাত্র কঠিন বিষয়গুলো এবং পরীক্ষার আগের ৩/৪ মাস। পরবর্তীতে, বিশেষত শহরাঞ্চলে ধর্ম, কৃষি শিক্ষা, বাংলা, সমাজ ইত্যাদি সব বিষয়েই প্রাইভেট পড়ানো শুরু হলো। এর কারণ হিসেবে অনেক শিক্ষার্থীর কাছে বলতে শুনেছি কিছু অসাধু শিক্ষকের কাছে বাধ্য হয়েই প্রাইভেট পড়তে হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে অভিভাবকদের অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলে। কারো কারো কাছে শুনেছি এক বিষয়ে একাধিক টিচারের কাছে পড়তে বাধ্য হয়। ফলে অনেকেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্কুল/কলেজ তারপর কোচিং/টিচারের কাছে ছোটা-ছুটি। এমন ব্যস্ততার কারণে তাদের খেলাধুলা বা বিনোদনের সময় থাকে না। তারা হয়ে উঠে রোবটের মতো। এসব কারণে ছেলে-মেয়েরা খিটখিটে মেজাজের হয়। তারা একটুতেই উত্তেজিত হয়, ক্লাশ ফাঁকি দেয়, অবাধ্য হয়ে ওঠে, স্কুল পালায়, এমনকি মাদকাসক্তি সহ নানান রকমের অপরাধে জড়িয়ে যায়। এরকম শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তারা মনে করতে শুরু করে বাবা মায়ের জন্যই পড়তে বাধ্য হচ্ছে, নিজেদের জন্য নয়। শ্রেণিকক্ষ তাদের কাছে তুলনামূলক কম গুরুত্ব লাভ করে, তখন একজন শিক্ষকের জন্য পড়া আদায় করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরপর আইন করে শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের শাস্তি না দেওয়ার বিধান যুক্ত হলো, এই আইনে শিক্ষার্থীদের সম্মানে আঘাত লাগে এমন কথাও বলা যাবে না। ফলে শিক্ষার্থীদের একটা অংশ বেপরোয়া হয়ে উঠল। তাদের মনে শিক্ষকদের সম্মান বোধের আর কিছু অবশিষ্ট রইলো না।

এরপর পাসের হার বাড়ানো এবং বেশি ফেল করলে সেই প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনার কারণে পরীক্ষা হলে পরিদর্শক কড়া গার্ড দিতে ব্যর্থ হলো, সাথে নৈর্ব্যক্তিক ও বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরের জন্য আঙুল দেখানো সিস্টেম তো আছেই। কোনো পরীক্ষার্থী যদি অন্য পরীক্ষার্থীকে উত্তর বলে না দিতো তাকেও পরীক্ষায় কড়া গার্ড দিলে পরীক্ষা শেষে শিক্ষককে প্রতিষ্ঠানের বাইরে

হেনস্থা করা শুরু হলো। উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানোর পরামর্শ দেওয়া হলো - যাতে পাসের হার বাড়ে। যে পরীক্ষকের উত্তরপত্র মূল্যায়নে বেশি ফেল করবে তাকে আবার প্রধান পরীক্ষকের কাছে জবাব দিতে হবে। এছাড়া এই সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নে এমনভাবে মানবণ্টন করা থাকে যেখানে শূন্য দেওয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং যারা ক্লাশে পড়াশোনা করে না তারাও কোনো রকমে পাস করে যায়। এ অবস্থায়ও যারা ফেল করে তাদের আসলে লেখাপড়া করার ইচ্ছা নাই। এমন অবস্থায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠে।

আমরা যখন শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হই তখন থেকে বাবা মা অন্যান্য বায়োজ্যেষ্ঠদের কাছে থেকে যে সব কবিতা শুনে বড় হয়েছি যেমন, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন যেন আমি ভালো হয়ে চলি। বাড়ির খাতায় হাতের লেখায় পৃষ্ঠা জুড়ে লিখতে হতো, সদা সত্য কথা বলিব, মিথ্যা বলা মহাপাপ, গুরুজনে সম্মান করিব, পিতা মাতাকে ভক্তি করিব; এমন অনেক সব নীতি বাক্য। যেগুলো প্রতিদিন পড়া ও লেখার মাধ্যমে শিশুমনে গ্রথিত হতো যা তাদের জীবনার্দশে পরিণত হতো। আমি যখন বড় হয়ে উঠছি তখন পাড়া মহল্লায় উঠতি যুবকদের লুকিয়ে ধূমপান করতে দেখেছি। বাবা মা তো দূরের কথা এলাকার গুরুজন যদি সিগারেট খেতে দেখে তাহলে সেটাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। এসব ছোট ছোট কাজের মাধ্যমেই নৈতিক শিক্ষা গড়ে উঠে। আর এখন গ্রাম ও শহর সর্বত্র সকল শ্রেণি ও বয়সের মানুষ প্রকাশ্যে ধূমপান করে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাস্তার মোড়ে 'টিন এজারদের' অশ্লীল আচরণ, খিস্তি খেউড় ও গালিগালাজ। এসব দেখে মনটা ভেঙে যায়। এদের দেখে শিক্ষক হিসেবে নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়। আর ভাবি সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চাকা উল্টো দিকে কিভাবে ঘোরানো যায়।

দীর্ঘ ১৬ বছরের দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে জেন-জির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। দীর্ঘ দিনের বঞ্চনার শিকার ছিল গোটা জাতি। জেন-জিও ছিল বিভক্ত, একই বয়সের সহপাঠীদের দ্বারা নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হতে হতে দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেছিল। শিক্ষার্থী সহ দেশের সবাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যেই যারা অত্যাচার করেছে এবং যারা অত্যাচারিত হয়েছে উভয়ই দলই জেন-জি। পার্থক্য কেবল একদল হয়েছিল শাসক শ্রেণির হাতিয়ার। বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা জিদ কাজ করতে শুরু করে - do or die - করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা। শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবী না মেনে যখন শাসক গোষ্ঠী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালালো তখনই ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত এসে দাড়াল 'সরকার পতনের এক দফা' দাবীতে। আমার মতে এ সময় পর্যন্ত মোটামুটি সব ঠিক ছিল। কিন্তু ৫ আগস্টের পর থেকে জেন-জির কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত অনেক আচরণ দেখছি যার কারণে ভবিষ্যতে আমাদের সমাজ কাঠামো ও দেশের অবস্থা নিয়ে অনেকের মতোই আমিও শঙ্কিত। আমাকে যে বিষয়টি সবচেয়ে পীড়া দিয়েছে তা হলো - শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষকদের জোরপূর্বক পদত্যাগে বাধ্য করা এবং শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা। এটা কি ওদের কাজ ছিল? যে ছাত্রী তার শিক্ষিকাকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করানোর জন্য টানাহ্যাঁচড়া করেছে কিংবা যে ছেলেটি তার শিক্ষকের গায়ে হাত তুলেছে - তারা ঐ সময় থেকে আর মনুষ্য পদবাচ্য রইলো না বলে আমার ধারণা।

শিক্ষকদের সাথে এসব অসভ্যতা কোনোভাবেই কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মেনে নিতে পারবেন না। সৎ, যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি এ সমাজে সব সময়ই ছিল। কোনো শিক্ষক যদি অযোগ্য, অপদার্থ কিংবা দুর্নীতিবাজ হন তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছ হতে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান পাবেন না। কিন্তু তাঁকে বা তাঁদের অপসারণ করার প্রয়োজন হলে - তার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ আছেন। এটা কোনোভাবেই ছাত্রছাত্রীদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। এভাবে পুরো শিক্ষক সমাজের জন্য ভীতিকর অবমাননাকর উন্মত্ত উদাহরণ আমাদের একেবারে আক্ষরিক অর্থেই আরো নিঃস্ব করে দিবে।

শিক্ষকদের দলীয় লেজুড়বৃত্তিও আমি সমর্থন আমি করি না। বড় বড় হোমড়া চোমড়া লোকদের উদ্দেশ্য করে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' গ্রন্থে ১৯৯৯ সালেই লিখেছেন, "সেদিন শিক্ষকসত্তার অহংকারে গলা উঁচু করে তাঁকে কথাগুলো বলেছিলাম, কিন্তু আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়; আমার নয়, সারাদেশে সবখানে তার দম্ভই আজ জয়ী হয়ে গেছে। জাতির শিক্ষকেরা আজ ছাত্রদের বাবার পয়সায় কেনা ব্যক্তিগত ভৃত্যের কাতারে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন।"

শিক্ষকদের লেজুড়বৃত্তি বন্ধ হোক, এখনই। কিন্তু, ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার করে নয়, তাদের বেয়াদব বানিয়ে নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এ কাজের জন্য প্রশাসন আছে, কর্তৃপক্ষ আছে। এর পিছনে যদি স্বার্থান্বেষী কোনো মহলের ইন্ধন থাকে বা অন্য কারো স্বার্থ কাজ করে থাকে, সেটাও শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে। আমার ধারণা তারা এত বড় বিপ্লব করতে পারে তারা নিশ্চয় অনেক মেধাবী। শিক্ষকদের কাকুতি-মিনতি দেখে মনে হচ্ছিল কবি কাদের নেওয়াজের শিক্ষকের মর্যাদা কবিতা এখন অপ্রাসঙ্গিক। তবে, আমি ঢালাওভাবে সকল শিক্ষার্থীকে একই পাল্লায় মাপতে চাই না। সংখ্যায় কিন্তু মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার্থীরাই বেশি, কিন্তু তারা সংগঠিত নয়। অন্যদিকে দুষ্টজন সর্বদা সংঘবদ্ধ। অভিমানী রংপুর পলিটেকনিক কলেজের শিক্ষার্থীদের দেখেছি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে এবং অধ্যক্ষের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে। আবার এটাও দেখেছি যে, জেন-জি দেশের ক্রান্তিকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘর ও উপাসনালয় পাহারা দিচ্ছে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করছে, ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করছে, বন্যা-দুর্গতদের পাশে দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু, অনেক ভালো কাজের মধ্যে সামান্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ খারাপ কাজ সব ভালো অর্জনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। বিষয়টা, এক পাতিল দুধের মধ্যে এক ফোটা গরুর চোনা পড়ার মতো। তাই যারা ভালো, তারা যদি ভয়ে মুখ না খুলে, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে তাহলে কীভাবে পরিবর্তন আসবে? সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে থাকা অন্যায়কে সমূলে উৎপাটন করতে হলে পিছপা হলে তো চলবে না। নাহলে তো আমরা আবারও পিছন দিকেই হাঁটতে থাকবো। এ ছাড়াও রয়েছে চুরি, ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড, কিশোর-গ্যাং খ্যাত অপরাধচক্রের নেতিবাচক ভূমিকা। এই জেন-জিরা যে কোনো ঝুঁকি নিতে পিছপা হয় না। কখনও এরা অনেক সময় অন্যের দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয়ে হটকারী ভূমিকা নেয়, এরা সহজ রাস্তায় দ্রুত ধন-সম্পদ লাভ করতে চায়। এরা আবার প্রযুক্তির সাথে একাত্ম, এদের অবসর কাটে নানা রকম বিধ্বংসী গেইম খেলে। এসব খেলতে খেলতে বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড এদের মজ্জাগত হয়ে যায়। মারামারি করা বা দেখা আজ এদের বিনোদনের অংশ হয়ে গেছে। তাই এদের সহজেই প্ররোচনা দিয়ে নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে লাগানে যায়। তাই রাষ্ট্র ও সমাজের উচিত এদের সঠিক পথ দেখানো। আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম তরুণ-তরুণী রয়েছে। সঠিক দিক-নির্দেশনা পেলে এদের হাত ধরেই এদেশ একদিন সত্যিকারের সোনার বাংলা হয়ে গড়ে উঠবে।

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে স্বশরীরে অংশগ্রহণ বা লেখার মাধ্যমে কোনো অনুপ্রেরণা প্রদানের সাহস করতে পারিনি; সামর্থ্যও হয়তো নেই। তবে মনে প্রাণে কামনা করেছি একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক। দেশ কল্যাণের দিকে যাক। বন্যার্তদের জন্য শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মানুষের কাছে সাহায্যে চাইছে - ভালো লাগছে। তবে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনার ব্যাপারেও যদি দেয়াল লিখন, ট্রাফিকের দায়িত্বপালন ও সাহায্য সংগ্রহ করার মত?ই দায়িত্বশীল হয়, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ক্লাস নিয়ে আনন্দ পেতেন। যদি পরীক্ষার হলে প্রথম থেকে শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত একই বৃত্ত (ভুল/সঠিক) ভরাট না করে সত্যিকারের পড়াশোনা করে জেনে বুঝে উত্তর দিত, তবে আরও ভালো লাগতো। আমি একজন শিক্ষক হিসেবে আমার প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ভালোবাসি, তাদের সবার মঙ্গল কামনা করি। ওরা আমাদের প্রাণ, অনেক দায়িত্বশীল শিক্ষকের পাশাপাশি অনেক দায়িত্বশীল শিক্ষার্থীও আছে। কিন্তু সংখ্যাটা আরও বেশি হওয়া দরকার। আশা করি এ দুর্যোগ শীঘ্রই কেটে যাবে, আমাদের সন্তানেরা দেশের মানুষের জন্য কাজ করার পাশাপাশি নিজের পড়াশোনার ব্যাপারেও দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে। ভালো থাকুক শিক্ষার্থীরা, ভালো থাকুক জেন-জি, ভালো থাকুক বাংলাদেশ! আমার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রইলো অফুরন্ত ভালোবাসা।

লেখক: নূর মহল খাতুন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক